তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
শব্দ প্রকরণ
পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

সব ভাষায় লিঙ্গাভেদে শব্দভেদ আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে।

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে **পুরুষবাচক শব্দ** আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে **স্ত্রীবাচক শব্দ** বলে। যেমন : বাপ–মা, ভাই–বোন, ছেলে–মেয়ে– কেউই মৃত্যুর সময় তার কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে পুরুষবাচক শব্দ; আর মা, বোন ও মেয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ। তৎসম পুরুষবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন– বিদ্বান লোক এবং বিদুষী নারী। এখানে 'লোক' পুরুষবাচক বিশেষ্য এবং 'নারী' স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। 'বিদ্বান' পুরুষবাচক বিশেষণ এবং 'বিদুষী' স্ত্রীবাচক বিশেষণ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়ম মানা হয় না। যেমন– সংস্কৃতে 'সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা' বাংলায় 'সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা'।

বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

১। বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে এবং ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রীজাতীয় অর্থে।

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে : আব্বা–আম্মা, চাচা–চাচী, কাকা–কাকী, জেঠা–জেঠী, দাদা–দাদী, নানা–নানী, নন্দাই–ননদ, দেওর–জা, ভাই–ভাবী/বৌদি, বাবা–মা, মামা–মামী ইত্যাদি।

২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় অর্থে : খোকা–খুকী, পাগল–পাগলী, বামন–বামনী, ভেড়া–ভেড়ী, মোরগ–মুরগী, বালক–বালিকা, দেওর–ননদ।

২। **বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়**

পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো : ঈ, নি, নী, আনী, ইনী, ন।

১. ঈ–প্রত্যয় : বেঙ্গামা–বেঙ্গামী, ভাগনা/ভাগনে–ভাগনী।

২. নী–প্রত্যয় : কামার–কামারনী, জেলে–জেলেনী, কুমার–কুমারনী, ধোপা–ধোপানী, মজুর–মজুরনী ইত্যাদি।

৩. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং আগের ঈ ই হয়। যেমন : ভিখারি–ভিখারিনী, অভিসারী–অভিসারিণী।

৪. আনী–প্রত্যয় : ঠাকুর–ঠাকুরানী, নাপিত–নাপিতানী, মেথর–মেথরানী, চাকর–চাকরানী ইত্যাদি।

৫. ইনী–প্রত্যয় : কাঙাল–কাঙালিনী, গোয়ালা–গোয়ালিনী, বাঘ–বাঘিনী ইত্যাদি।

উন–প্রত্যয় : ঠাকুর–ঠাকরুন / ঠাকুরানী।

আইন–প্রত্যয় : নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : ঠাকুর–ঠাকুরাইন।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় কতগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন– অভাগা–অভাগী/অভাগিনী, ননদাই–ননদিনী/ননদী ইত্যাদি।

৩। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোর পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন– সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা ইত্যাদি।

৪। কতগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দ এবং স্ত্রী, মাদী, মাদা ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন – নর / মদ্দা / হুলো বিড়াল–মেনি বিড়াল; মদ্দা হাঁস–মাদী হাঁস; মদ্দা ঘোড়া–মাদী ঘোড়া; পুরুষ লোক–মেয়েলোক / স্ত্রীলোক; বেটাছেলে–মেয়েছেলে; পুরুষ কয়েদী –স্ত্রী / মেয়ে কয়েদী; এঁড়ে বাছুর–বকনা বাছুর; বলদ গরু–গাই গরু ইত্যাদি।

৫। কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন– কবি–মহিলা কবি, ডাক্তার–মহিলা ডাক্তার, সভ্য–মহিলা সভ্য, কর্মী–মহিলা কর্মী, শিল্পী–মহিলা বা নারী শিল্পী, সৈন্য–নারী / মহিলা সৈন্য, পুলিশ–মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

৬। কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : বোন–পো– বোন–ঝি, ঠাকুর–পো–ঠাকুর–ঝি, ঠাকুর দাদা / ঠাকুরদা–ঠাকুরমা, গয়লা –গয়লা–বউ, জেলে–জেলে বউ ইত্যাদি।

৭। অনেক সময় আলাদা আলাদা শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন : বাবা–মা, ভাই–বোন, কর্তা–গিন্নী, ছেলে–মেয়ে, সাহেব–বিবি, জামাই–মেয়ে, বর–কনে, দুলহা–দুলাইন/দুলহিন, বেয়াই–বেয়াইন, তাঐ–মাঐ, বাদশা–বেগম, শুক–সারী ইত্যাদি।

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ঈ, আনী, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন–

১. আ–যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : মৃত–মৃতা, বিবাহিত–বিবাহিতা, মাননীয়–মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়–প্রিয়া, প্রথম–প্রথমা, চতুর–চতুরা, চপল–চপলা, নবীন–নবীনা, কনিষ্ঠ–কনিষ্ঠা, মলিন–মলিনা ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : অজ–অজা, কোকিল–কোকিলা, শিষ্য–শিষ্যা, ক্ষত্রিয়–ক্ষত্রিয়া, শূদ্র–শূদ্রা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিরুক্ত শব্দ

দ্বিরুক্ত অর্থ দুবার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দুইবার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন– 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে।' অর্থাৎ ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে এই প্রয়োগ।

দ্বিরুক্ত শব্দ নানা রকম হতে পারে :

(ক) শব্দের দ্বিরুক্তি

১. একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে। যথা– ভালো ভালো ফল, ফোঁটা ফোঁটা পানি, বড় বড় বই ইত্যাদি।

২. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যথা– ধন–দৌলত, খেলা–ধুলা, লালন–পালন, বলা–কওয়া, খোঁজ–খবর ইত্যাদি।

৩. দ্বিরুক্ত শব্দ–জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়। যেমন– মিট–মাট, ফিট–ফাট, বকা–ঝকা, তোড়–জোড়, গল্প–সল্প, রকম–সকম ইত্যাদি।

৪. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে। যেমন– লেন–দেন, দেনা–পাওনা, টাকা–পয়সা, ধনী–গরিব, আসা–যাওয়া ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তি

১. দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন– ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভেবেছি।

২. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ–বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন– চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

(ক) বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে	:	রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
২. সামান্য বোঝাতে	:	আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।
৩. পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে	:	তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ	:	ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে	:	তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আগ্রহ বোঝাতে	:	ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।

২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি, নরম নরম হাত।

৩. সামান্যতা বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব; কালো কালো চেহারা ।

(গ) সর্বনাম শব্দ

বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : কে কে এলো? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে : এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।

২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।

৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?

৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

(ঙ) অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?

২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।

৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।

৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি।

৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন

একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মরীতি। যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন–

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে : চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।

২. শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে : মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।

৩. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে : ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।

৪. সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে : চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।

৫. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে : ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।

৬. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে : ছোট–বড়, আসা–যাওয়া, জন্ম–মৃত্যু, আদান–প্রদান।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

বিভক্তিযুক্ত পদের দুইবার ব্যবহারকে **পদাত্মক দ্বিরুক্তি** বলা হয়। এগুলো দুই রকমে গঠিত হয়। যেমন–

১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুইবার ব্যবহার। যথা – **ভয়ে ভয়ে** এগিয়ে গেলাম। **হাটে হাটে** বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।

২. যুগ্মরীতিতে গঠিত দ্বিরক্ত পদের ব্যবহার। যথা– হাতে নাতে, আকাশে–বাতাসে, কাপড়–চোপড়, দলে–বলে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

ফুলগুলো তুই আনরে **বাছা বাছা**। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

লোকটা **হাড়ে হাড়ে** শয়তান। (আধিক্য)

খাঁচার **ফাঁকে ফাঁকে**, পরশে **মুখে মুখে**, নীরবে **চোখে চোখে** যায়।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুইবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন–

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার	:	**ভেউ ভেউ** – মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি। এরূপ –ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।
২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার	:	**ঘেউ ঘেউ** (কুকুরের ধ্বনি)। এরূপ–মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।
৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার	:	ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ)। এরূপ–মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ) ঝমঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।
৪. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার	:	**ঝিকিমিকি** (ঔজ্জ্বল্য)। এরূপ– ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার মতো অনুভূতি)। অনুরূপভাবে– মিন মিন, পিট পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠন

১. একই (ধ্বন্যাত্মক) শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ	:	ধক ধক, ঝন ঝন, পট পট।
২. প্রথম শব্দটির শেষে আ যোগ করে	:	গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।
৩. দ্বিতীয় শব্দটির শেষে ই যোগ করে	:	ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি।

৪. যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কিচির মিচির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের শব্দ), হাপুস হুপুস (গোগ্রাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।

৫. আনি–প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য দ্বিরুক্ত গঠিত হয় : পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়। তোমার বকবকানি আর ভালো লাগে না।

বিভিন্ন পদরূপে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার

১. বিশেষ্য : বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।

২. বিশেষণ : 'নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।'

৩. ক্রিয়া : কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : 'চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।'

অনুশীলনী

১। দ্বিরুক্তি বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী?

২। বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে দ্বিরুক্তি সাধিত হয়?

৩। দ্বিরুক্তি সাধনের তিনটি উপায় উদাহরণসহ লেখ।

৪। পাঁচটি করে উদাহরণ দাও

(ক) বিপরীতার্থক যুগ্মরীতি

(খ) সহচর যুগ্মরীতি

(গ) ধ্বন্যাত্মক যুগ্মরীতি

৫। অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও

কানে কানে, ধনে জনে, আকারে প্রকারে, দেশে বিদেশে, রাতে দিনে, তেলে বেগুনে, ঘর সংসার, ধ্যান ধারণা, চলনে বলনে।

৬। সঠিক উত্তরটি লিখে দাও

ক. অনুভূতিজাত ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি : ঝমঝম/ঝিমঝিম

খ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি : হয় না/হয়

গ. বিশেষ্য দ্বিরুক্তি : ভালোয় ভালোয়/উঁচায় নিচায়

ঘ. ক্রিয়ায় দ্বিরুক্তি : যায় যায়/হাঁটি হাঁটি

ঙ. ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিরুক্তি : ধীরে ধীরে/উড়ু উড়ু

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক 'এক'। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা করতে পারি। যেমন : এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে হয় দশ টাকা।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার

১. অঙ্কবাচক, ২. পরিমাণ বা গণনাবাচক, ৩. ক্রম বা পূরণবাচক ও ৪. তারিখবাচক।

১. অঙ্কবাচক সংখ্যা

'তিন টাকা' বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোঝায়। আমাদের একক হলো 'এক'। সুতরাং এক + এক + এক = তিন।

এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি। এক থেকে একশ পর্যন্ত এভাবে গণনার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুণোত্তর পদ্ধতি।

এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬), সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে বলে অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) দিতে হয়। এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যাটির দশগুণ। এটিই দশ গুণোত্তর প্রণালীর নিয়ম। এ ধরনের প্রতিটি 'দশ'কে একক ধরে আমরা বিশ বা কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চল্লিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০), সত্তর (৭০), আশি (৮০), নব্বই (৯০) পর্যন্ত গণনা করি। তারপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)।

এভাবে আমরা দশের গুণন ও এককের সংকলন করে বিভিন্ন সংখ্যা লিখে থাকি। যেমন : এক দশ + এক = এগার (১০+১=১১), এক দশ চার = চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি। এভাবে দশকের ঘরে দুই (২) হলে বলি দুই দশ = বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক = একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ – তিন দশ + এক = একত্রিশ, চার দশ + এক = একচল্লিশ ইত্যাদি।

২. পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা

একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা–ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন– সপ্তাহ বলতে আমরা সাত দিনের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকি। সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ। এখানে দিন একটি একক। এরূপ–সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ।

পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : একগুণ = এক। যেমন– একেক্কে এক (অর্থাৎ ১×১=১), এরকম–দুয়েক্কে দুই, সাতেক্কে সাত ইত্যাদি। দুই গুণ= দ্বিগুণ বা দুগুণ। যেমন –দুই দু গুণে চার (২×২=৪)।

অনুরূপভাবে, পাঁচ দু গুণে দশ (৫×২=১০), সাত দু গুণে চৌদ্দ (৭×২=১৪)। তিন গুণ = তিরিক্কে। যেমন– তিন তিরিক্কে নয় (৩×৩=৯)।
চার গুণ = চার বা চৌকা। যেমন– তিন চারে বা চৌকা বার (৩×৪=১২)
পাঁচ গুণ = পাঁচা। যেমন– পাঁচ পাঁচা পঁচিশ (৫×৫=২৫)।
ছয় গুণ = ছয়ে। যেমন– তিন ছয়ে আঠার (৩×৬=১৮)।
সাত গুণ = সাতা। যেমন– তিন সাতা একুশ (৩×৭=২১)
আট গুণ = আটা। যেমন– তিন আটা (বা তে আটা) চব্বিশ (৩×৮=২৪)।
নয় গুণ = নং বা নয়। যেমন– তিন নং (বা তিন নয়) সাতাশ (৩×৯=২৭)।
দশ গুণ = দশং বা দশ। যেমন– তিন দশং (বা তিন দশে) ত্রিশ (৩×১০=৩০)।
বিশ গুণ = বিশং বা বিশ। যেমন – তিন বিশং (বা তিন বিশ) ষাট (৩×২০=৬০)।
ত্রিশ গুণ = ত্রিশং বা ত্রিশ। যেমন– তিন ত্রিশং (বা তিন ত্রিশ) নব্বই (৩×৩০=৯০)।

এরূপ– চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই, বা শ'–এর পূরণবাচক সংখ্যা গণনা করা হয়।

পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক 'সংখ্যা শব্দ'

(ক) ন্যূন

এক	এককের	চার ভাগের	এক	ভাগ	($\frac{১}{৪}$)	=	চৌথা, সিকি বা পোয়া।
”	”	তিন ভাগের	”	”	($\frac{১}{৩}$)	=	তেহাই।
”	”	দুই ভাগের	”	”	($\frac{১}{২}$)	=	অর্ধ বা আধা।
”	”	আট ভাগের	”	”	($\frac{১}{৮}$)	=	আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাংশ।

তেমনি– এক পঞ্চমাংশ ($\frac{১}{৫}$), এক দশমাংশ ($\frac{১}{১০}$) ইত্যাদি। এ সবের আরও ভাঙতি হলে, যেমন– চার ভাগের তিন ($\frac{৩}{৪}$) = তিন চতুর্থাংশ। আট ভাগের তিন ($\frac{৩}{৮}$) = তিন অষ্টমাংশ ইত্যাদি। এক এককের ($\frac{৩}{৪}$) কে পরবর্তী সংখ্যার পৌনে বলা হয়। যেমন– পৌনে তিন = (২ $\frac{৩}{৪}$), পৌনে ছয় = (৫ $\frac{৩}{৪}$) ইত্যাদি।

পৌনে অর্থ পোয়া অংশ বা এক চতুর্থাংশ ($\frac{১}{৪}$) কম। অর্থাৎ পৌনে = (১– $\frac{১}{৪}$) = $\frac{৩}{৪}$ ।

সওয়া = ১ $\frac{১}{৪}$ (সওয়া বা সোয়া এক)

দেড় = ১ $\frac{১}{২}$ = $\frac{১}{২}$ কম ২।

আড়াই = ২ $\frac{১}{২}$ = $\frac{১}{২}$ কম ৩।

এগুলো ছাড়া অর্ধযুক্ত থাকলে সর্বত্র 'সাড়ে' বলা হয়। যেমন– ৩ $\frac{১}{২}$ = সাড়ে তিন, ৪ $\frac{১}{২}$ = সাড়ে চার ইত্যাদি।

৩. ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন– **দ্বিতীয়** লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। **দ্বিতীয়** লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় **'প্রথম'** এবং প্রথম লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় **দ্বিতীয়**। এরূপ– তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

৪. তারিখবাচক শব্দ : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে।

যেমন–পয়লা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি। তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি শব্দ বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

নিচে বাংলা অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো

অঙ্ক বা সংখ্যা	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছউই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নউই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনের	পঞ্চদশ	পনেরই
১৯	উনিশ	ঊনবিংশ	উনিশে
২০	বিশ/কুড়ি	বিংশ	বিশে
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে

অনুশীলনী

১. অঙ্কবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক রূপ দেখাও।

৩. নিচের শব্দগুলোকে সংখ্যা শব্দে দেখাও:

চৌথা, নবম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, আড়াই, পৌনে চার, সওয়া তিন, একবিংশ, ঊনবিংশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বচন

'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার : **একবচন** ও **বহুবচন**।

একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে **একবচন** বলে। যেমন – **সে** এলো। **মেয়েটি** স্কুলে যায়নি।

বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে **বহু বচন** বলে। যেমন : **তারা** গেল। **মেয়েরা** এখনও আসেনি।

কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়। কোনো কোনো সময় টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন – গরুটা, বাছুরটা, কলমটা, খাতাখানা, বইখানি ইত্যাদি।

বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশিরভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন–

(ক) রা–কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন– **ছাত্ররা** খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। **শিক্ষকেরা** জ্ঞান দান করেন।

যে ধরনের শব্দে 'রা' যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় 'এরা' ব্যবহৃত হয়। যেমন – **মেয়েরা ঝিয়েরা** একত্র হয়েছে। সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন – '**পাখিরা** আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় **পিপীলিকারা** বিধাতার কাছে পাখা চায়।' **কাকেরা** এক বিরাট সভা করল।

(খ) গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন – **অতগুলো** কুমড়া দিয়ে কী হবে? **আমগুলো** টক। **টাকাগুলো** দিয়ে দাও। **ময়ূরগুলো** পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে।

(ক) উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

গণ	–	দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি।
বৃন্দ	–	সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি।
মণ্ডলী	–	শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি।
বর্গ	–	পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।

(খ) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

কুল	–	কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, বৃক্ষকুল ইত্যাদি।
সকল	–	পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি।
সব	–	ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি।
সমূহ	–	বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি।

(গ) অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ

আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি। যেমন–গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘকুঞ্জ, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : পাল ও যূথ শব্দ দুটি কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন – রাখাল **গরুর পাল** লয়ে যায় মাঠে। **হস্তিযূথ** মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

(ক) বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন – সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু–ই বোঝায়)। **পোকার** আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)। বাগানে **ফুল** ফুটেছে (বহুবচন)।

(খ) একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন– **অজস্র** লোক, **অনেক** ছাত্র, **বিস্তর** টাকা, **বহু** মেহমান, **নানা** কথা, **ঢের** খরচ, **অঢেল** টাকা পয়সা ইত্যাদি।

(গ) অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন – **হাঁড়ি হাঁড়ি** সন্দেশ। **কাঁড়ি কাঁড়ি** টাকা। **বড় বড়** মাঠ। **লাল লাল ফুল**।

(ঘ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন।

বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য – **মেয়েরা** কানাকানি করছে। এটাই **করিমদের** বাড়ি। **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতিদিন জন্মায় না। **সকলে** সব জানে না।

(ঙ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন – আন যোগে : বুজুর্গ–বুজুর্গান, সাহেব–সাহেবান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ওপরে বর্ণিত বহুবচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দের অধিকাংশই তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত এবং সে কারণে অধিকাংশই সাধু রীতি ও সংস্কৃত শব্দে প্রযোজ্য। খাঁটি বাংলা শব্দের বহুবচনে এবং চলিত রীতিতে রা, এরা, গুলা, গুলো, দের – এসব প্রত্যয় এবং অনেক, বহু, সব – এসব শব্দের ব্যবহারই বহুল প্রচলিত।

একইসঙ্গে দুইবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন – **সব মানুষই** অথবা **মানুষ** অথবা **মানুষেরা** মরণশীল (শুদ্ধ)। **সকল মানুষেরাই** মরণশীল (ভুল)।

অনুশীলনী

১। বচন কাকে বলে? বাংলা ভাষায় বচন কয় প্রকার ও কী কী?

২। বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশের উপায় কী কী? দশটি বহুবচনবোধক শব্দের উদাহরণ দিয়ে তোমার বক্তব্য পরিষ্কার কর।

৩। প্রাণিবাচক, অপ্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দে যেসব বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ ও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তার তিনটি করে উদাহরণ দাও।

৪। বিশেষ নিয়মে বহুবচন গঠনের কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ কর।

৫। ভুল থাকলে শুদ্ধ কর।

আমাদের স্কুলের সকল ছাত্ররাই আজ সভায় উপস্থিত। সব গরুগণেরা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এ খবর দিয়ে দাও। ভাইগণ, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

৬। ক. ডান দিক থেকে যথাযোগ্য শব্দটি এনে বাঁ দিকের শিরোনামের ডানে বসাও।

একবচন – ছাত্র, মা, তোমরা,পাখিগুলো, গরু, দেশ

বহুবচন – লোকেরা, তাদের, ধনী, গরিব, বেড়াল।

খ. ডান দিক থেকে বহুবচনবোধক শব্দ/ শব্দাংশ নিয়ে বাঁ দিকের শব্দে যোগ কর

কুসুম, ফল, ভাই, দোকান, সাধু কলম, স্যার, মাথা, কাপড়, বই	গুলা, রা, এরা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদাশ্রিত নির্দেশক

কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে **পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক** বলে। বাংলায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The'–এর স্থানীয়। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।

(ক) একবচনে – টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন– টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, বইখানি, লাঠিগাছা, চুড়িগাছি ইত্যাদি।

(খ) বহুবচনে – গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন – মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, পটলগুলিন ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

১. (ক) 'এক' শব্দের সঙ্গে টা, টি, যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– একটি দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– তিনটি টাকা, দশটি বছর।

(খ) নিরর্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি–র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন–**সারাটি** সকাল তোমার আশায় বসে আছি। **ন্যাকামিটা** এখন রাখ।

(গ) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন – **ওটি** যেন কার তৈরি? **এটা** নয় **ওটা** আন। **সেইটেই** ছিল আমার প্রিয় কলম।

২. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোটা' শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন–

গোটা দেশই ছারখার হয়ে গেছে। **গোটাদুই** কমলালেবু আছে (অনির্দিষ্ট)। **দুখানা** কম্বল চেয়েছিলাম (নির্দিষ্ট)। **গোটাসাতেক** আম এনো। **একখানা** বই কিনে নিও (অনির্দিষ্ট)।

কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধন**খানি**।

৩. টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন – **পোয়াটাক** দুধ দাও (অনির্দিষ্টতা)। **সবটুকু** ওষুধই খেয়ে ফেলো (নির্দিষ্টতা)।

৪. বিশেষ অর্থে, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ : তা, পাটি ইত্যাদি। যেমন–

তা : দশ **তা** কাগজ দাও।

পাটি : আমার এক**পাটি** জুতো ছিঁড়ে গেছে।

অনুশীলনী

১। পদাশ্রিত নির্দেশক কাকে বলে? বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকদের কী রূপভেদ হয়?

২। টি, টা, খানা, খানি – এ চারটি পদাশ্রিত নির্দেশকের প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা কর।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর

.... পাঁচেক,

.... টি,

মুখ ....,

দুধ ....

৪। শুদ্ধ কর

দুখানি নয় চারখানি নয়, একগোটা ছেলে আমার। মুখ কিতা টুকটুকে লাল। দেশখানির নামটুকুন কী? দশগোটা বেজেছে।

৫। ভুল থাকলে শুদ্ধ করে লেখ

(ক)	টা, টি, খানা, খানি	–	বহু বচনে ব্যবহৃত হয়।
(খ)	রা, এরা, গুলি, গুলা	–	এক বচনে ব্যবহৃত হয়।
(গ)	টুকু, টুকুন	–	স্বল্পতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
(ঘ)	তা, পাটি	–	শব্দের আগে বসে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাস

সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। তবে খাঁটি বাংলা সমাসের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলোতে সংস্কৃতের নিয়ম খাটে না।

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম **সমস্ত পদ**।

সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে **সমস্যমান পদ** বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)–কে বলা হয় **পূর্বপদ** এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)–কে বলা হয় **উত্তরপদ** বা **পরপদ**।

সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য**। উদাহরণ–বিলাত–ফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন। এখানে বিলাত–ফেরত, রাজকুমার ও সিংহাসন – এ তিনটিই সমাসবদ্ধ পদ। এগুলোর গঠন প্রক্রিয়া ও রকম – বিলাত হতে ফেরত, রাজার কুমার,সিংহ চিহ্নিত আসন – এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য। এসব ব্যাসবাক্যে 'বিলাত', ফেরত', 'রাজা, 'কুমার,' 'সিংহ', 'আসন' হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ। আর বিলাত–ফেরত, রাজকুমার এবং সিংহাসন সমস্ত পদ। বিলাত, রাজা ও সিংহ হচ্ছে পূর্বপদ এবং ফেরত, কুমার ও আসন হচ্ছে পরপদ।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস।

[দ্বিগু সমাসকে অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কর্মধারয়কেও তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। এদিক থেকে সমাস মূলত চারটি : দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব। কিন্তু সাধারণভাবে ছয়টি সমাসেরই আলোচনা করা গেল। এছাড়া, প্রাদি, নিত্য, অলুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলোরও আলোচনা করা হয়েছে।]

১. দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন – তাল ও তমাল = তাল–তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত–কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং , ও, আর – এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন – মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১.	মিলনার্থক শব্দযোগে	:	মা–বাপ, মাসি–পিসি, জ্বিন–পরি, চা–বিস্কুট ইত্যাদি।
২.	বিরোধার্থক শব্দযোগে	:	দা–কুমড়া, অহি–নকুল, স্বর্গ–নরক ইত্যাদি।
৩.	বিপরীতার্থক শব্দযোগে	:	আয়–ব্যয়, জমা–খরচ, ছোট–বড়, ছেলে–বুড়ো, লাভ–লোকসান ইত্যাদি।
৪.	অঙ্গবাচক শব্দযোগে	:	হাত–পা, নাক–কান, বুক–পিঠ, মাথা–মুণ্ডু, নাক–মুখ ইত্যাদি।
৫.	সংখ্যাবাচক শব্দযোগে	:	সাত–পাঁচ, নয়–ছয়, সাত–সতের, উনিশ–বিশ ইত্যাদি।
৬.	সমার্থক শব্দযোগে	:	হাট–বাজার, ঘর–দুয়ার, কল–কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা–পত্র ইত্যাদি।
৭.	প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে	:	কাপড়–চোপড়, পোকা–মাকড়, দয়া–মায়া, ধূতি–চাদর ইত্যাদি।
৮.	দুটি সর্বনামযোগে	:	যা–তা, যে–সে, যথা–তথা, তুমি–আমি, এখানে–সেখানে ইত্যাদি।
৯.	দুটি ক্রিয়াযোগে	:	দেখা–শোনা, যাওয়া–আসা, চলা–ফেরা, দেওয়া–থোওয়া ইত্যাদি।
১০.	দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে	:	ধীরে–সুস্থে, আগে–পাছে, আকারে–ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
১১.	দুটি বিশেষণযোগে	:	ভালো–মন্দ, কম–বেশি, আসল–নকল, বাকি–বকেয়া ইত্যাদি।

অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে **অলুক দ্বন্দ্ব** বলে। যেমন – দুধে–ভাতে, জলে–স্থলে, দেশে–বিদেশে, হাতে–কলমে।

* তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব–বিবি–গোলাম, হাত–পা–নাক–মুখ–চোখ ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন – নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট। কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন – যে চালাক সেই চতুর = চালাক–চতুর।

২. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন – যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

৩. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃতন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – আগে ধোয়া পরে মোছা= ধোয়ামোছা।

৪. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন – সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।

৫. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন – মহৎ যে জ্ঞান= মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।

৬. পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যেমন – কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।

৭. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন – মহান যে রাজা = মহারাজ।

৮. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন –সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার – মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস।

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে**। যথা– সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ= স্মৃতিসৌধ।

২. উপমান কর্মধারয় : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় **উপমেয়**, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় **উপমান**। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন – ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো **সাধারণ ধর্ম**। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলে। যথা – তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।

৩. উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** বলে (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন – মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ। পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ।

৪. রূপক কর্মধারয় : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে **রূপক কর্মধারয় সমাস** হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন– ক্রোধ রূপ অনল =ক্রোধানল, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন রূপ মাঝি= মনমাঝি।

আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন – **অব্যয়** : কুকর্ম, যথাযোগ্য। **সর্বনাম** : সেকাল, একাল। **সংখ্যাবাচক শব্দ** : একজন, দোতলা। **উপসর্গ** : বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর ।

৩. তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন – বিপদকে আপন্ন= বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত ।

ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। এরকম : গা–ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, ছেলে–ভুলানো (ছড়া), নভেল–পড়া ইত্যাদি।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।

ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : **এক দ্বারা ঊন = একোন,** বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচ কম।

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত। এরূপ–হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে । যথা– গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা= আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি= বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি। এরূপ–ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমঙ্গল, মুসাফিরখানা, হজ্বযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি,বালিকা–বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা – খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

সাধারণত চ্যুত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত ইত্যাদি। এ রকম জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর' 'চেয়ে' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যথা– পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

অনুরূপভাবে –ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, শ্বশুরবাড়ি, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

১. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ', পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন গজনীর রাজা = গজনীরাজ, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্রের বধূ=পুত্রবধূ ইত্যাদি।

২. পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, সহ, প্রতিম – এসব শব্দ থাকলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – পত্নীর সহ =পত্নীসহ, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম / সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।

৩. কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা– অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ।

৪. পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা– ছাত্রের বৃন্দ =ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম=গুণগ্রাম, হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ ইত্যাদি।

৫. অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন – পথের অর্ধ= অর্ধপথ, দিনের অর্ধ=অর্ধদিন।

৬. শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন – মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

৭. ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন – পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি। কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা। এরূপ – বাকপটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিখ্যাত, ভোজনপটু, দানবীর, বাক্সবন্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমরা ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন –পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব।

৭. **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** : না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা– ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ – অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন – ন কাল = অকাল বা আকাল। তদ্রূপ– আধোয়া, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

না–বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যথা–

অভাব	–	ন	বিশ্বাস	=	অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব)।
ভিন্নতা	–	ন	লৌকিক	=	অলৌকিক ।
অল্পতা	–	ন	কেশা	=	অকেশা।
বিরোধ	–	ন	সুর	=	অসুর।
অপ্রশস্ত	–	ন	কাল	=	অকাল
মন্দ	–	ন	ঘাট	=	অঘাট।

এরূপ – অমানুষ, অসজ্ঞাত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস** : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ–প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে **উপপদ তৎপুরুষ সমাস**। যেমন – জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ। এরূপ –গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা–চাটা, পাড়াবেড়ানি, ছা–পোষা ইত্যাদি।

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস** : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে **অলুক তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ–ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : গায়ে–হলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুব্রীহি সমাস।

৪. বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। যথা– বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা : আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা (স্ত্রী), মহান আত্মা যার = মহাত্মা, স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা, নীল বসন যার = নীলবসনা, স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি।

'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন : বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার = সহোদর > সোদর। এরূপ – সজল, সফল, সদর্প, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন : নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক, বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক। এরূপ –সস্ত্রীক, অপুত্রক ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দ স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ। এরূপ – ঊর্ণনাভ।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'জায়া' শব্দ স্থানে 'জানি' হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন : যুবতী জায়া যার = যুবজানি (যুবতী স্থলে 'যুব' এবং 'জায়া' স্থলে জানি হয়েছে)।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'চূড়া' শব্দ সমস্ত পদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্ত পদে 'কর্মা' হয়। যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।

বহুব্রীহি সমাসে 'সমান' শব্দের স্থানে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন : সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ, সমান উদর যাদের = সহোদর।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ' শব্দ স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যথা : সুগন্ধ যার = সুগন্ধি, পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এরকম : হৃতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্ত, কমবখ্ত ইত্যাদি।

২. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। যথা : আশীতে (দাঁতে) বিষ যার= আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা। অনুরূপভাবে – ছা–পোষা, পা–চাটা, পাতা–চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে **ব্যতিহার বহুব্রীহি** হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যথা : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি ভাবে –চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

৪. নঞ্ বহুব্রীহি

বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ্ বহুব্রীহি বলে । নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন : ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, বে (নাই) হেড যার = বেহেড, না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার। নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা ইত্যাদি। এরকম–নাহক, নিরুপায়, নির্ঝঞ্ঝাট, অবুঝ, অকেজো, বে–পরোয়া, বেহুঁশ, অনন্ত, বেতার ইত্যাদি।

৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন : বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনি ভাবে – গায়ে হলুদ, মেনিমুখো ইত্যদি।

৬. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি । যথা– এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ+আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি–খরচে (খরচ+এ)। এরকম –দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, ঊনপাঁজুরে ইত্যাদি।

৭. অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার= গলায়গামছা (লোকটি)। এরূপ – হাতে–ছড়ি, কানে–কলম, গায়ে–পড়া, হাতে–বেড়ি, মাথায়–ছাতা, মুখে–ভাত, কানে–খাটো ইত্যাদি।

৮. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যথা – দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা । এরূপ –চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

কিন্তু, সে (তিন) তার (যে যন্ত্রের) = সেতার (বিশেষ্য)।

৯. নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি

দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

৫. দ্বিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন : তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা, শত অব্দের সমাহার–শতাব্দী, পঞ্চবটের সমাহার–পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার–ত্রিপদী ইত্যাদি। এরূপ–অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র ইত্যাদি।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হলো।

১. সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।

২. বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ।

৩. অভাব (নিঃ = নির) : আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব=নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।

৪. পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।

৫. সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন।

৬. অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ–যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।

৭. অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।

৮. বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।

৯. পশ্চাৎ (অনু) : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন।

১০. ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।

১১. ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।

১২. পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম) : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ।

১৩. দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ। এরূপ –প্রপিতামহ।

১৪. প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব।

১৫. প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর।

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্রাদি, নিত্য, উপপদ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এসব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়।

১. **প্রাদি সমাস** : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যথা : প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ –পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ =অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

২. **নিত্যসমাস** : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।

অনুশীলনী

১. সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

২. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের এবং বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে কর্মধারয় সমাস হয়, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।

৩. ‘দ্বিগু সমাস প্রকৃত প্রস্তাবে আলাদা সমাস নয়, এটি কর্মধারয় সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত’–আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪. উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।

৫. তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে সবগুলো তৎপুরুষ সমাসের নাম কর।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দম্পতি, ধানক্ষেত, প্রগতি, বেতার, সহশিক্ষা।

৭. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৮. উদাহরণ দাও

সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বসে যে সমাস হয়, অলুক তৎপুরুষ, বহুব্রীহি সমাসের 'সহ' স্থলে 'স' হয়, অব্যয় পদ আগে বসে যে সমাস হয়, উপমেয়ের সাথে উপমানের যে সমাস হয়।

৯. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) দাও

ক. তৎপুরুষ সমাস হয় –পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় / সমান বিভক্তি বিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদে যে সমাস হয় / পূর্বপদে অব্যয় যোগে যে সমাস হয়।

খ. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সে সমাস হয় তাকে বলে –দ্বন্দ্ব / বহুব্রীহি / অলুক / দ্বিগু সমাস।

গ. উপমান–উপমেয়ের যে সমাস হয় তাকে বলে –নিত্যসমাস / প্রাদি সমাস / কর্মধারয় সমাস।

১০. সমাসবদ্ধ শব্দ লেখ এবং ডান দিক থেকে ঠিক সমাসের নামটি পাশে লেখ–

কাঁচা অথচ মিঠা	:	তৎপুরুষ	মা মরেছে যার	:	অব্যয়ীভাব
মহান যে নবি	:	কর্মধারয়	দশ হাত পরিমাণ যার	:	বহুব্রীহি
দুধে ভাতে	:	দ্বন্দ্ব	তিন ফলের সমাহার	:	দ্বিগু।
বিলাত থেকে ফেরত	:	তৎপুরুষ			

সপ্তম পরিচ্ছেদ
উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।

২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।

৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে। এবং

৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। যেমন – 'কাজ' একটি শব্দ । এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' – যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

'পূর্ণ' (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' যোগ করায় 'পরিপূর্ণ' হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ (অর্থে ও আকৃতিতে)। 'হার' শব্দের পূর্বে 'আ' যুক্ত করে 'আহার' (খাওয়া), 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা), 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ),'পরি' যোগ করে 'পরিহার' (ত্যাগ), 'উপ' যোগ করে 'উপহার' (পুরস্কার), 'সম' যোগ করে 'সংহার' (বিনাশ) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

এ উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে : বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) এবং বিদেশি উপসর্গ।

১. বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

নিচে এদের প্রয়োগ দেখানো হলো।

	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
১.	অ	নিন্দিত	অর্থে	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	–	অভাব	”	অচিন, অজানা, অথৈ
	–	ক্রমাগত	”	অঝোর, অঝোরে

	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
২.	অঘা	বোকা	অর্থে	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
৩.	অজ	নিতান্ত (মন্দ)	”	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
৪.	অনা	অভাব	”	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	–	ছাড়া	”	অনাছিষ্টি, অনাচার
	–	অশুভ	”	অনামুখো
৫.	আ	অভাব	’’	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি
	–	বাজে, নিকৃষ্ট	”	আকাঠা, আগাছা
৬.	আড়	বক্র	”	আড়চোখে, আড়নয়নে
	–	আধা, প্রায়	”	আক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
	–	বিশিষ্ট	”	আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবর), আড়কাঠি
৭.	আন	না	”	আনকোরা
	–	বিক্ষিপ্ত	”	আনচান, আনমনা
৮.	আব	অস্পষ্টতা	”	আবছায়া, আবডাল
৯.	ইতি	এ বা এর	”	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	–	পুরনো	”	ইতিকথা, ইতিহাস
১০.	ঊন (ঊনা)	কম	”	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ
১১.	কদ্	নিন্দিত	”	কদবেল, কদর্য, কদাকার
১২.	কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	”	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ
১৩.	নি	নাই/নেতি	”	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট
১৪.	পাতি	ক্ষুদ্র	”	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো
১৫.	বি	ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয়	”	বিভূঁই, বিফল, বিপথ
১৬.	ভর	পূর্ণতা	”	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে
১৭.	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	”	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
১৮.	স	সঙ্গে	”	সরাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
১৯.	সা	উৎকৃষ্ট	”	সাজিরা, সাজোয়ান
২০.	সু	উত্তম	”	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
২১.	হা	অভাব	”	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

জ্ঞাতব্য : বাংলা উপসর্গ সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বেই যুক্ত হয়ে থাকে।

বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের বাক্যে প্রয়োগ : 'আমি অবেলাতে দিলাম পাড়ি অথৈ সায়রে।' অঘারাম বাস করে অজ পাড়াগাঁয়ে। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। আকাঠার নায়ে দিলাম কাঁঠালের গলুই। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'। ইতিহাস কথা কয়। ঊনাভাতে দুনা বল। নিনাইয়ার শতেক নাও। ভর দুপুরে কোথায় যাও? এতদিন কোথায় নিখোঁজ হয়েছিলে?

২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকোচন সম্প্রসারণ করে থাকে।

তৎসম উপসর্গ বিশটি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে। বাংলা উপসর্গের মধ্যে আ, সু, বি, নি– এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন –আকাশ, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি–ও বাংলা। আর আকণ্ঠ, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। কাজেই এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি–ও তৎসম উপসর্গ।

নিচে বিশটি তৎসম উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হলো

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
১.	প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	অর্থে	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
	–	খ্যাতি	”	প্রসিন্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
	–	আধিক্য	”	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
	–	গতি	”	প্রবেশ, প্রস্থান
	–	ধারা–পরম্পরা বা অনুগামিত	”	প্রপৌত্র, প্রশাখা,
২.	পরা	আতিশয্য	’’	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
	–	বিপরীত	’’	পরাজয়, পরাভব
৩.	অপ	বিপরীত	’’	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	–	নিকৃষ্ট	’’	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
	–	স্থানান্তর	’’	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
	–	বিকৃত	’’	অপমৃত্যু

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
৪.	সম্	সম্যক রূপে	অর্থে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	–	সম্মুখে	,,	সমাগত, সম্মুখ
৫.	নি	নিষেধ	,,	নিবৃত্তি
	–	নিশ্চয়	,,	নিবারণ, নির্ণয়
	–	আতিশয্য	,,	নিদাঘ, নিদারুণ
	–	অভাব	,,	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
৬.	অব	হীনতা	,,	অবজ্ঞা, অবমাননা
	–	সম্যকভাবে	,,	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	–	নিম্নে/অধোমুখিতা	,,	অবতরণ, অবরোহণ
	–	অল্পতা	,,	অবশেষ, অবসান, অবেলা
৭.	অনু	পশ্চাৎ	,,	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
	–	সাদৃশ্য	,,	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
	–	পৌনঃপুন	,,	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
	–	সঙ্গে	,,	অনুকূল, অনুকম্পা
৮.	নির	অভাব	,,	নিরব, নির্জীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ধন
	–	নিশ্চয়	,,	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	–	বাহির/বহির্মুখিতা	,,	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
৯.	দুর	মন্দ	,,	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
	–	কষ্টসাধ্য	,,	দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
১০.	বি	বিশেষ রূপে	,,	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক
	–	অভাব	,,	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
	–	গতি	,,	বিচরণ, বিক্ষেপ
	–	অপ্রকৃতস্থ	,,	বিকার, বিপর্যয়
১১.	সু	উত্তম	,,	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
	–	সহজ	,,	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	–	আতিশয্য	,,	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
১২.	উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	,,	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
	–	আতিশয্য	অর্থে	উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন
	–	প্রস্তুতি	’’	উৎপাদন, উচ্চারণ
	–	অপকর্ষ	’’	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
১৩.	অধি	আধিপত্য	’’	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
	–	উপরি	’’	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	–	ব্যাপ্তি	’’	অধিকার, অধিবাস, অধিগত
১৪.	পরি	বিশেষ রূপ	’’	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	–	শেষ	’’	পরিশেষ
	–	সম্যক রূপে	’’	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
	–	চতুর্দিক	’’	পরিভ্রমণ, পরিমণ্ডল
১৫.	প্রতি	সদৃশ	’’	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	–	বিরোধ	’’	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	–	পৌনঃপুন	,,	প্রতিদিন, প্রতিমাস
		অনুরূপ কাজ	,,	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
১৬.	উপ	সামীপ্য	’’	উপকূল, উপকণ্ঠ
	–	সদৃশ	’’	উপদ্বীপ, উপবন
	–	ক্ষুদ্র	’’	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
	–	বিশেষ	’’	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
১৭.	অভি	সম্যক	’’	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত
	–	গমন	’’	অভিযান, অভিসার
	–	সম্মুখ বা দিক	’’	অভিমুখ, অভিবাদন
১৮.	অতি	আতিশয্য	’’	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	–	অতিক্রম	’’	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
১৯	আ	পর্যন্ত	’’	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	–	ঈষৎ	’’	আরক্ত, আভাস
	–	বিপরীত	’’	আদান, আগমন

বাক্যে তৎসম উপসর্গের প্রয়োগ

কালের প্রভাবে নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে। ওসমান রণক্ষেত্রে বীরত্বের **পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন** করেও **পরাজিত** হলেন। **সমাগত** সুধীজনকে সাদর **অভিনন্দন** জানানো হলো। তাঁর পুত্রদের সঙ্গে চিঠিপত্র **আদান–প্রদান** নেই বলে তাঁর দুঃখের সীমা–**পরিসীমা** নেই।

৩. বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি – এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এর কতগুলো খাঁটি উচ্চারণে আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এ সঙ্গে কতগুলো বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় **বেমালুম** মিশে গিয়েছে। বেমালুম শব্দটিতে 'মালুম' আরবি শব্দ আর 'বে' ফারসি উপসর্গ। এরূপ– বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেয়া হলো।

ক. ফারসি উপসর্গ

	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
১.	কার্	কাজ	অর্থে	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
২.	দর্	মধ্যস্থ, অধীন	,,	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান
৩.	না	না	,,	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
৪.	নিম্	আধা	,,	নিমরাজি, নিমখুন
৫.	ফি	প্রতি	,,	ফি–রোজ, ফি–হপ্তা, ফি–বছর, ফি–সন, ফি–মাস
৬.	বদ্	মন্দ	,,	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
৭.	বে	না	,,	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার
৮.	বর্	বাইরে, মধ্যে	,,	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
৯.	ব্	সহিত	,,	বমাল, বনাম, বকলম
১০.	কম্	স্বল্প	,,	কমজোর, কমবখ্ত

খ. আরবি উপসর্গ

১.	আম্	সাধারণ	,,	আমদরবার, আমমোক্তার
২.	খাস	বিশেষ	,,	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
৩.	লা	না	,,	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
৪.	গর্	অভাব	,,	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

গ. ইংরেজি উপসর্গ

	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	অর্থে	উদাহরণ
১.	ফুল	পূর্ণ	’’	ফুল–হাতা, ফুল–শার্ট, ফুল–বাবু, ফুল–প্যান্ট
২.	হাফ	আধা	’’	হাফ–হাতা, হাফ–টিকেট, হাফ–স্কুল, হাফ–প্যান্ট
৩.	হেড	প্রধান	’’	হেড–মাস্টার, হেড–অফিস, হেড–পণ্ডিত, হেড–মৌলভি
৪.	সাব	অধীন	’’	সাব–অফিস, সাব–জজ, সাব–ইন্‌সপেক্টর

ঘ. উর্দু–হিন্দি উপসর্গ

হর : প্রত্যেক অর্থে – হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

বাক্যে বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ

হিসেবে **গরমিল** থাকলে **খাসমহল** লাটে উঠবে। **বহাল** তবিয়তে **দস্তখত** করে **ফি–রোজ হেড অফিসে** আসা যাওয়া কর।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কয় শ্রেণির উপসর্গের ব্যবহার আছে? প্রত্যেক শ্রেণির পাঁচটি করে উদাহরণ দাও।

২। ‘উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ–দ্যোতকতা আছে।’ – বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলা, তৎসম, বিদেশি– প্রত্যেক শ্রেণির তিনটি করে উপসর্গের উদাহরণ দিয়ে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৪। অর্থ উল্লেখ করে বাক্য রচনা কর

দরকাঁচা, বরবাদ, ফি–হপ্তা, না–মঞ্জুর, বেহেড, কারখানা, লা–জওয়াব, অনুগমন, অতিবৃষ্টি, প্রতিদিন, বদনজর

৫। পার্থক্য নির্দেশ কর ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও

বনাম–বেনাম; সুবাদ–অপবাদ; বহাল–বেহাল; বিগত–আগত; নিঃশ্বাস–প্রশ্বাস; অনুজ্ঞা–অবজ্ঞা;

৬। শুদ্ধ হলে (√) চিহ্ন এবং অশুদ্ধ হলে (x) চিহ্ন দাও।

ক. উপসর্গ স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. অন্য শব্দের আগে বসে।

গ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির কোনো পরিবর্তন হয় না।

ঘ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

৭। নিচের কোনটি কোন ধরনের উপসর্গ?

নিখাদ, প্রতিদিন, ফি–বছর, বেহায়া, অনুসরণ, উপহার, আলুনি, বেতমিজ, নিখুঁত, ফুলবাবু, বিভুঁই, অনুবাদ, পাতিহাঁস, রামছাগল, নিমরাজি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধাতু

বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর সাধারণ আলোচনা

বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। সেসব ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। অন্যকথায় ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় : (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন – 'করে' একটি ক্রিয়াপদ। এতে দুটো অংশ রয়েছে : কর্ +এ; এখানে 'কর্' ধাতু এবং 'এ' বিভক্তি। সুতরাং 'করে' ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো 'কর্' আর ক্রিয়া বিভক্তি হলো 'এ' । অন্যকথায় 'কর্' ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'করে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

প্রচলিত বেশকিছু ধাতু বা ক্রিয়ামূল চেনার একটা উপায় হলো : বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করা । কারণ, এই রূপ আর ধাতুরূপ এক। যেমন –তুই, কর্, খা, যা, ডাক্, দেখ্, লেখ্ ইত্যাদি। এগুলো যেমন ধাতুও, তেমনি মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদও ।

ধাতুর প্রকারভেদ

ধাতু তিন প্রকারের : (১) মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু এবং (৩) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. মৌলিক ধাতু

যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোই মৌলিক ধাতু। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন –চল্, পড়্, কর্, শো, হ, খা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (ক) বাংলা, (খ) সংস্কৃত এবং (গ) বিদেশি ধাতু।

ক. বাংলা ধাতু : যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি সেগুলো হলো বাংলা ধাতু। যেমন – কাট্, কাঁদ, জান্, নাচ্ ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন – কৃ, গম্, ধৃ, গঠ্, স্থা ইত্যাদি।

এখানে সংস্কৃত ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদ এবং সংস্কৃত ধাতুর একই অর্থবোধক বাংলা ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদের উদাহরণ দেয়া হলো।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঙ্ক্	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক্	আঁকা
কথ্	কথ্য, কথিত	কহ্	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন, কর্তিত	কাট্	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর্	করা, করে

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
ক্রন্দ্	ক্রন্দন	কাঁদ্	কাঁদা, কাঁদুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কিন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ্	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ্	গঠিত	গড়্	গড়া, গড়ন
ঘৃষ্	ঘৃষ্ট, ঘর্ষণ	ঘষ্	ঘষা
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ্	দেখা, দেখন
ধৃ	ধৃত, ধারণ	ধর্	ধরা, ধরন
পঠ্	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়্	পড়া, পড়ন
বন্ধ্	বন্ধন	বাঁধ্	বাঁধন, বাঁধা
বুধ্	বুদ্ধ, বোধ	বুঝ্	বুঝা
রক্ষ্	রক্ষণ, রক্ষিত, রক্ষী	রাখ্	রাখা
শ্রু	শ্রবণ, শ্রুত	শুন্	শুনা, শোনা
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক্	থাকা
হস্	হাস, হাসন	হাস্	হাসা, হাসি

গ. বিদেশাগত ধাতু : প্রধানত হিন্দি এবং ক্বচিৎ আরবি–ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে **বিদেশাগত** ধাতু বা **ক্রিয়ামূল** বলা হয়। যেমন – ভিক্ষে **মেগে** খায়। এ বাক্যে **'মাগ্'** ধাতু হিন্দি **'মাঙ্'** থেকে আগত। এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয় **অজ্ঞাতমূল** ধাতু। যেমন – **'হের** ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?'এ বাক্যে **'হের'** ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

এখানে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেয়া হলো।

ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়
আঁট	শক্ত করে বাঁধা	ফির্	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
খাট্	মেহনত করা	চাহ্	প্রার্থনা করা
চেঁচ্	চিৎকার করা	বিগড়	নষ্ট হওয়া
জম্	ঘনীভূত হওয়া	ভিজ্	সিক্ত হওয়া
ঝুল্	দোলা	ঠেল্	ঠেলা
টান্	আকর্ষণ	ডাক্	আহ্বান করা
টুট্	ছিন্ন হওয়া	লটক্	ঝুলানো
ডর্	ভীত হওয়া		

২. সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু কিংবা কোনো কোনো নাম –শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন – দেখ্ + আ= দেখা, পড়+আ= পড়া, বল+আ=বলা। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় । যেমন – মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। (এখানে দেখ্+আ+বর্তমান কালের সাধারণ নামপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি 'য়' = দেখায়) । এরূপ –শোনায়, বসায় ইত্যাদি।

গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু তিন শ্রেণিতে বিভক্ত :

ক. নাম ধাতু, খ. প্রযোজক (নিজন্ত) ধাতু, (গ) কর্মবাচ্যের ধাতু।

ক. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয় তা–ই নাম ধাতু। যেমন –সে ঘুমাচ্ছে। 'ঘুম্' থেকে নাম ধাতু 'ঘুমা'। 'ধমক্' থেকে নাম ধাতু 'ধমকা' । যেমন আমাকে ধমকিও না।

খ. প্রযোজক ধাতু : মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা নিজন্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন – কর্ + আ= করা (এখানে 'করা' একটি ধাতু) । যেমন – সে নিজে করে না, আর একজনকে দিয়ে করায়। অনুরূপভাবে– পড় + আ=পড়া; তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

গ. কর্মবাচ্যের ধাতু : মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যমধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যথা – দেখ্+ আ=দেখা; কাজটি ভালো দেখায় না। হার্+আ=হারা; 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেস্টা বেটাই চোর।'

'কর্মবাচ্যের ধাতু' বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন– 'দেখায়' এবং 'হারায়' প্রযোজক ধাতু।

৩. সংযোগমূলক ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তা–ই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন – যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর্ (ধাতু) = 'যোগ কর' (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য– তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ করো। সাবধান (বিশেষ্য) +হ (ধাতু) = সাবধান হ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য– এখনও সাবধান হও, নতুবা আখেরে খারাপ হবে। সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই–ই হতে পারে। নিচে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. কর্–ধাতু যোগে

ক. বিশেষ্যের সঙ্গে	:	ভয় কর্, লজ্জা কর্, গুণ কর্
খ. বিশেষণের সঙ্গে	:	ভালো কর্, মন্দ কর্, সুখী কর্
গ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে	:	ক্রয় কর্, দান কর্, দর্শন কর্, রান্না কর্
ঘ. ক্রিয়াজাত (কৃদন্ত) বিশেষণের সঙ্গে	:	সঞ্চিত কর্, স্থগিত কর্
ঙ. ক্রিয়া–বিশেষণের সঙ্গে	:	জলদি কর্, তাড়াতাড়ি কর্, একত্র কর্

চ. অব্যয়ের সঙ্গে : না কর্, হাঁ কর্, হায় হায় কর্, ছি ছি কর্

ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে : খাঁ খাঁ কর্, বন বন কর্, টন টন কর্

জ. ধ্বন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে : চট কর্, ধাঁ কর্, হন হন কর্

২. হ–ধাতু যোগে : বড় হ, ছোট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ

৩. দে–ধাতু যোগে : উত্তর দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে

৪. পা–ধাতু যোগে : কান্না পা, ভয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা

৫. খা–ধাতু যোগে : মার খা, হিমশিম খা, ছাক খা, ঘষা খা

৬. কাট্–ধাতু যোগে : সাঁতার কাট্, ভেংচি কাট্, জিভ কাট্

৭. ছাড়্–ধাতু যোগে : গলা ছাড়্, ডাক ছাড়্, হাল ছাড়্

৮. ধর্–ধাতু যোগে : গলা ধর্, ঘুণে ধর্, পচা ধর্, মাথা ধর্, গোঁ ধর্।

অনুশীলনী

১। ধাতু বলতে কী বোঝ? ক্রিয়াপদ দেখে সহজে ধাতু চেনার উপায় কী?

২। ধাতু কয় প্রকার ও কী কী? সংস্কৃত মূল ধাতু ও বাংলা মূল ধাতুর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৩। নিচের সাধিত পদসমূহের ধাতু নির্ণয় কর এবং সাধিত ধাতুটি তৎসম হলে তার বাংলা রূপ এবং বাংলা হলে তার তৎসম রূপ নির্ণয় করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

খাদ্য, কথিত, বুঝ, নাচন, কথা, দৃশ্য, শেখা, দর্শন

৪। সাধিত ধাতু কী? সাধিত ধাতু কয় ভাগে বিভক্ত? এদের নাম লেখ।

৫। "বিভিন্ন পদের সঙ্গে 'কর' বা 'খা' ধাতুর সংযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়" – উদাহরণ দাও।

৬। ক. কোন্‌টি ঠিক? ধাতু– দুই প্রকার/ তিন প্রকার/ চার প্রকার

খ. বিদেশি ধাতু কোন্‌টি ? কাট্ / কৃৎ / টান্

৭। ডান দিক থেকে শব্দ এনে ঠিক সংজ্ঞার পার্শ্বে বসাও

মৌলিক ধাতু ––––– কৃ, চল্, পড়্, খাদ্, আঁট

সাধিত ধাতু ––––– শোনায়, বসায়, মুচড়ানো

যৌগিক ধাতু–––– উত্তর দে, মার খা, ভয় পা।

নবম পরিচ্ছেদ

কৃৎ প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা

তোমরা লক্ষ করেছ যে, ক্রিয়ামূলকে বলা হয় ধাতু, আর ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কালবাচক বিভক্তি যোগ করে গঠন করা হয় **ক্রিয়াপদ**। ধাতুর সঙ্গে যখন কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি–সমষ্টি যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ তৈরি হয়, তখন (১) ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় **ক্রিয়া প্রকৃতি** বা **প্রকৃতি**; আর (২) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে বলে **কৃৎ–প্রত্যয়**। যেমন– চল্ (ক্রিয়া প্রকৃতি)+ অন (কৃৎ–প্রত্যয়)= চলন (বিশেষ্য পদ)। চল্ (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন্ত (কৃৎ–প্রত্যয়)=চলন্ত (বিশেষণ পদ)।

‘প্রকৃতি’ কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে √ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ প্রকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করলে **‘প্রকৃতি’** শব্দটি লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন –√পড়+ উয়া =পড়ুয়া। √নাচ্+উনে = নাচুনে।

কৃৎ–প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় **কৃদন্ত পদ**। যেমন – ওপরের উদাহরণে ‘পড়ুয়া’ ও ‘নাচুনে’ কৃদন্ত পদ।

তৎসম বা সংস্কৃত প্রকৃতির সঙ্গেও অনুরূপভাবে কৃৎ–প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত পদ সাধিত হয়। যেমন – √গম্+অন=গমন, √কৃ+তব্য=কর্তব্য ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ–প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ–প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় **গুণ ও বৃদ্ধি** ।

১. **গুণ** : (ক) ই, ঈ–স্থলে এ, (খ) উ, ঊ–স্থলে ও এবং (গ) ঋ–স্থলে অর্ হয়। যেমন – √চিন্+আ=চেনা (ই স্থলে এ হলো); √নী+আ=নেওয়া (ঈ স্থলে এ); ’ √ধু+আ =ধোয়া (উ স্থলে ও) ; কৃ+তা = করতা> কর্তা (ঋ স্থলে অর্)।

২. **বৃদ্ধি** : (ক) অ–স্থলে আ, (খ) ই ও ঈ–স্থলে ঐ, (গ) উ ও ঊ স্থলে ঔ এবং (ঘ) ঋ–স্থলে আর্ হয়। যেমন – পচ্ + অ (ণক) = পাচক (পচ–এর অ স্থলে ‘আ’); শিশু+ অ(ষ্ণ) = শৈশব (ই স্থলে ঐ); যুব+ অন= যৌবন (উ স্থলে ঔ); কৃ+ঘ্যণ= কার্য (ঋ স্থলে আর্)।

বাংলা কৃৎ–প্রত্যয়

কৃৎ–প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : বাংলা

১. **(০) শূন্য–প্রত্যয়** : কোনো প্রকার প্রত্যয়–চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া–প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে (০) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন – এ মোকদ্দমায় তোমার জিত্ হবে না, হার্–ই হবে। গ্রামে খুব ধর্ পাকড় চলছে।

২. **অ–প্রত্যয়** : কেবল ভাববাচ্যে অ–প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন – √ধর্+ অ=ধর, √মার +অ=মার। আধুনিক বাংলায় অ–প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন – √হার্ + অ=হার, √জিত্+ অ = জিত।

কোনো কোনো সময় অ–প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়। যেমন – (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত) √কাঁদ্ + অ = কাঁদকাঁদ (চেহারা)। এরূপ – √পড়+অ=পড়পড়, √মর্+অ=মরমর (অবস্থা) ইত্যাদি। কখনো কখনো দ্বিত্বপ্রাপ্ত কৃদন্ত পদে উ–প্রত্যয় হয়। যেমন – √ডুব্+উ= ডুবুডুবু। √উড়+উ = উড়ুউড়ু।

৩. **অন্–প্রত্যয়:** ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন – √কাঁদ্ + অন= কাঁদন (কান্নার ভাব)। এরূপ – নাচন, বাড়ন, ঝুলন, দোলন।

বিশেষ নিয়ম

(ক) আ–কারান্ত ধাতুর সঙ্গে অন্ স্থলে 'ওন' হয়। যেমন – √খা+অন=খাওন, √ছা+অন=ছাওন, √দে+অন=দেওন।

(খ) আ–কারান্ত প্রযোজক (ণিজন্ত) ধাতুর পরে 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হলে 'আনো' হয়। যেমন – √জানা+আন= জানানো। এরূপ –শোনানো, ভাসানো।

৪. **অনা–প্রত্যয় :** √দুল্+ অনা= দুলনা> দোলনা। √খেল্+ অনা=খেলনা।

৫. **অনি, (বিকল্পে) উনি–প্রত্যয়:** √চির্+অনি=চিরনি>চিরুনি। √বাঁধ্+অনি=বাঁধনি > বাঁধুনি। √আঁট+অনি=আঁটনি> আঁটুনি।

৬. **অন্ত–প্রত্যয়:** বিশেষণ গঠনে 'অন্ত' প্রত্যয় হয়। যেমন – √উড়+অন্ত =উড়ন্ত, √ডুব্+অন্ত=ডুবন্ত।

৭. **অক–প্রত্যয় :** √মুড়+অক=মোড়ক। √ঝল্+অক=ঝলক।

৮. **আ–প্রত্যয় :** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'আ' প্রত্যয় হয়। যেমন √পড়+আ=পড়া (পড়া বই)। এরূপ রাঁধ (বিশেষ্য), রাঁধা (বিশেষণ), কেনা, বেচা, ফোটা ইত্যাদি।

৯। **আও–প্রত্যয় :** ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে 'আও' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন– √পাকড়+আও= পাকড়াও, √চড় +আও=চড়াও।

১১. **আন (আনো) প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে 'আন/আনো' প্রত্যয় হয়। যেমন – √চাল্ =আন =চালান/চালানো। √মান্+ আন = মানান/মানানো।

১২. **আনি–প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত হয়। যেমন – √জান্ + আনি=জানানি, √শুন্+আনি=শুনানি, √উড় + আনি=উড়ানি, √উড়+উনি=উড়ুনি।

১৩. **আরি বা আরী বিকল্পে রি/উরি–প্রত্যয় :** যেমন – √ডুব্+আরি / উরি=ডুবুরী। এরূপ –ধুনারী, পূজারী ইত্যাদি

১৪. **আল–প্রত্যয় :** √মাত্+আল = মাতাল, √মিশ্+আল =মিশাল।

১৫. **ই–প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে 'ই' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা–√ভাজ্+ই = ভাজি, √বেড়+ই= বেড়ি।

১৬. **ইয়া > ইয়ে–প্রত্যয় :** বিশেষণ গঠনে ইয়া/ ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন – √মর্ +ইয়া=মরিয়া (মরতে প্রস্তুত), √বল্ + ইয়ে=বলিয়ে (বাকপটু)। এরূপ – নাচিয়ে, গাইয়ে, লিখিয়ে, বাজিয়ে, কইয়ে ইত্যাদি।

১৭. **উ–প্রত্যয় :** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'উ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা – √ডাক্ + উ= ডাকু, √ঝাড় + উ= ঝাড়ু, √উড়+উ= উড়ু (দ্বিত্ব উড়ুউড়ু)

১৮. **'উয়া' বিকল্পে 'ও' – প্রত্যয় :** বিশেষ্য বিশেষণ গঠনে 'উয়া' এবং 'ও' প্রত্যয় হয়। যথা – √পড় + উয়া= পড়ুয়া > পড়ো, √উড়+ উয়া= উড়ুয়া > উড়ো, √উড়+ও +উড়ো (চিঠি)।

১৯. **তা–প্রত্যয় :** বিশেষণ গঠনে 'তা' প্রত্যয় হয়। যেমন – √ফির্+তা = ফিরতা> ফেরতা, √পড় + তা= পড়তা, √বহ্+ তা = বহতা।

২০. **তি–প্রত্যয় :** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'তি' প্রত্যয় হয়। যেমন – √ঘাট্+তি=ঘাটতি, √বাড়+তি=বাড়তি। এরূপ – কাটতি, উঠতি ইত্যাদি।

২১. **না–প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে 'না' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন – √কাঁদ্ + না = কাঁদনা > কান্না, √রাঁধ্+না=রাঁধনা> রান্না। এরূপ–ঝরনা ইত্যাদি।

কৃৎ–প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : সংস্কৃত

১. **অনট্–প্রত্যয় :** ('ট' ইৎ (বিলুপ্ত) হয়, 'অন' থাকে) : √নী+অনট্= √নী+অন>নে+অন (গুণসূত্রে) = নয়ন, √শ্রু+ অনট্= √শ্রু+অন (গুণ ও সন্ধির ফলে) = শ্রবণ। এরূপ – স্থান, ভোজন, নর্তন, দর্শন ইত্যাদি।

২. **ক্ত–প্রত্যয় ('ক্' ইৎ 'ত' থাকে) :** √জ্ঞা+ক্ত (জ্ঞা+ত) = জ্ঞাত, √খ্যা+ক্ত=খ্যাত।

বিশেষ নিয়ম

(ক) ক্ত–প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্ত্যস্বর 'ই' কার হয়। যেমন – √পঠ্+ক্ত=(পঠ্+ই+ত) = পঠিত। এরূপ –লিখিত, বিদিত, বেষ্টিত, চলিত, পতিত, লুণ্ঠিত, ক্ষুধিত, শিক্ষিত ইত্যাদি।

(খ) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্তস্থিত 'চ' ও 'জ' স্থলে 'ক' হয়। যেমন– √সিচ্+ক্ত=(সিক্+ত) সিক্ত। এরূপ–√মুচ্+ক্ত=মুক্ত, √ভুজ্+ক্ত=ভুক্ত।

(গ) এ ছাড়া ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। এখানে এরূপ কয়েকটি প্রকৃতি–প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন– √গম্+ক্ত = গত, √গ্রন্থ্+ক্ত = গ্রথিত, √চুর্+ক্ত = চূর্ণ, √ছিদ্+ক্ত=ছিন্ন, √জন্+ক্ত=জাত, √দা+ক্ত=দত্ত, √দহ্+ক্ত=দগ্ধ, √বচ্+ক্ত=উক্ত, √বপ্+ক্ত=উপ্ত, √মুহ্+ক্ত=মুগ্ধ, √যুধ্+ক্ত=যুদ্ধ, √লভ্+ক্ত=লব্ধ, √স্বপ্+ক্ত=সুপ্ত, √সৃজ্+ক্ত=সৃষ্ট, √হন্+ক্ত= হত ইত্যাদি।

৩. **ক্তি–প্রত্যয় ('ক' ইৎ 'তি' থাকে) :** √গম্+ ক্তি=√গম্+তি=গতি (এখানে 'ম' লোপ হয়েছে)।

বিশেষ নিয়ম

(ক) ক্তি–প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা– √মন্+ক্তি=মতি, √রম্+ক্তি=রতি।

(খ) কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ–কারের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ আ–কার হয়। যেমন – √শ্রম্+ক্তি=শ্রান্তি (সন্ধিসূত্রে ম>ন), √শম্+ক্তি=শান্তি।

(গ) 'চ' এবং 'জ' স্থলে 'ক' হয়। যেমন –√বচ্+ক্তি=উক্তি, √মুচ্+ক্তি=মুক্তি, √ভজ্+ক্তি=ভক্তি।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ : √গৈ+ক্তি=গীতি, √সিধ্+ক্তি=সিদ্ধি, √বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি, √শক্+ক্তি=শক্তি।

৪. তব্য ও অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে (ক) তব্য ও (খ) অনীয় প্রত্যয় হয়।

(ক) তব্য : √কৃ+তব্য=কর্তব্য, √দা+তব্য=দাতব্য, √পঠ্+তব্য=পঠিতব্য।

(খ) অনীয় : √কৃ+অনীয়=করণীয়, √রক্ষ্+অনীয় = রক্ষণীয়। এরূপ–দর্শনীয়, পানীয়, শ্রবণীয়, পালনীয় ইত্যাদি।

৫. তৃচ্–প্রত্যয় ('চ' ইৎ 'তৃ' থাকে) : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন– √দা+তৃচ্=√দা+তৃ=√দা+তা= দাতা √মা+তৃচ্=মাতা, √ক্রী+তৃচ্=ক্রেতা।

বিশেষ নিয়মে : √যুধ্ +তৃচ=√যুধ্+তা=যোদ্ধা।

৬. ণক–প্রত্যয় ('ণ' ইৎ 'অক' থাকে) : √পঠ্+ণক=√পঠ্+অক=পাঠক। মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'অ' স্থানে 'আ' হয়েছে। যেমন–√নী=ণক=(নৈ+অক–প্রথম স্বরের বৃদ্ধি) নায়ক, √গৈ+ণক=গায়ক, √লিখ্+ণক= লেখক ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম

(ক) ণক–প্রত্যয় পরে থাকলে ণিজন্ত ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন – √পূজি+ণক=পূজক। এরূপ– জনক, চালক, স্তাবক।

(খ) আ–কারান্ত ধাতুর পরে ণক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়' আসে। যথা–√দা+ণক=দায়ক, বি– √ধা+ণক=বিধায়ক।

৭. ঘ্যণ–প্রত্যয় [ঘ,ণ–ইৎ, য (য–ফলা) থাকে] : কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ্ হয়। যথা– √কৃ+ঘ্যণ্=কার্য্য>কার্য, √ধৃ+ঘ্যণ্=ধার্য। এরূপ –পরিহার্য, বাচ্য, ভোজ্য, যোগ্য, হাস্য ইত্যাদি।

(**দ্রষ্টব্য :** আধুনিক বাংলা বানানে রেফ+য+য=র্য্য হয় না, র্য হয়।)

৮. য–প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও ঔচিত্য অর্থে 'য' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'য' যুক্ত হলে আ–কারান্ত ধাতুর আ–কার স্থলে এ–কারান্ত হয় এবং 'য' 'য়' হয়। যেমন – √দা +য=দা>দে+য>য়=দেয়। √হা+য=হেয়।

এরূপ –বিধেয়, অজেয়, পরিমেয়, অনুমেয় ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম : ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর 'য' প্রত্যয় স্থলে য–ফলা হয়। যথা–√গম্+য=গম্য, √লভ্+য=লভ্য।

৯. ণিন–প্রত্যয় (ণ ইৎ, ইণ্ থাকে, ইন্ 'ঈ'–কার হয়) : √গ্রহ + ণিন=গ্রাহী, √পা+ণিন=পায়ী। এরূপ– কারী, দ্রোহী, সত্যবাদী, ভাবী, স্থায়ী, গামী। কিন্তু 'ণিন' যুক্ত হলে 'হন' ধাতুর স্থলে 'ঘাত' হয়। যথা – আত্ম–√হণ্+ণিন=আত্মঘাতী।

১০. ইন্ প্রত্যয় (ইন্)=ঈ–কার হয়) : √শ্রম্+ইন্=শ্রমী।

১১. অল্–প্রত্যয় (ল ইৎ, অ থাকে) : √জি+অল্=জয়, √ক্ষি+অল্ = ক্ষয়। এরূপ–ভয়, নিচয়, বিনয়, ভেদ, বিলয়। ব্যতিক্রম : √হণ্+অল্=বধ।

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় কৃৎ–প্রত্যয়

১. ইষ্ণু–প্রত্যয় : √চল্+ইষ্ণু = চলিষ্ণু। এরূপ –ক্ষয়িষ্ণু, বর্ধিষ্ণু।

২. বর–প্রত্যয় : √ঈশ্+বর=ঈশ্বর, √ভাস্+বর =ভাস্বর। এরূপ–নশ্বর, স্থাবর।

৩. র–প্রত্যয় : √হিন+স্+র=হিংস্র, √নম্+র=নম্র।

৪. **উক/উক–প্রত্যয়** : √ভু+উক=(ভৌ+উক) =ভাবুক, জাগৃ+উক=(জাগর+উক) জাগরূক।

৫. **শানচ্–প্রত্যয় ('শ' ও 'চ' ইৎ, 'আন' বিকল্পে 'মান' থাকে)** : √দীপ্+ শানচ্=দীপ্যমান। এরূপ – √চল্+শানচ্=চলমান, √বৃধ্+শানচ্=বর্ধমান।

৬. **ঘঞ–প্রত্যয়** [(কৃদন্ত বিশেষ্য গঠনে), ঘ্ এবং ঞ ইৎ, 'অ' থাকে] : √বস্+ঘঞ্=বাস, √যুজ্+ঘঞ্= যোগ, √ক্রুধ্+ঘঞ্=ক্রোধ, √খিদ্+ঘঞ্=খেদ, √ভিদ্+ঘঞ্=ভেদ।

বিশেষ নিয়ম : √ত্যজ্+ঘঞ্=ত্যাগ, √পচ্ +ঘঞ্=পাক, √শুচ্+ঘঞ্=শোক।

কিন্তু, √নন্দি+অন=নন্দন। এক্ষেত্রে আ যোগে 'নন্দনা' হয় না।

অনুশীলনী

১। ধাতু ও ক্রিয়া প্রকৃতির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর

(ক) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে–––––।

(খ) কৃৎ–প্রত্যয়সাধিত পদটিকে বলা হয়–––––।

৩। গুণ ও বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ?

৪। নিচের প্রত্যয়গুলোর কোনটি 'ইৎ' হয় লেখ।

অনট্, আন্, শানচ্, তৃচ্, ণিন্, ঘঞ্, ঘ্যণ্, ক্তি, ক্ত

৫। নিচের কৃৎ–প্রত্যয়সাধিত শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। √পঠ্+ক্ত=পঠিত, √শম্+ক্তি=শান্তি, √শুচ্+ঘঞ্=শোক, √নী+তৃচ্=নেতা

৬। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

নাচুনে, ঝরনা, নিবুনিবু, চেনা, মাতাল, ভূত, লিখিত, বুদ্ধ, চরণ, উক্তি, অনুরাগী, বিধায়ক, জাগরূক

৭। ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর

জমানো, ডরানো, হাঁকানো, লটকানো, ঝরনা

৮। যেটি ঠিক তার ডানে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক. ক্রিয়ামূলকে/ ক্রিয়ার কালকে/ক্রিয়াপদকে/ অক্রিয়াবাচক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপ্রকৃতি।

খ. কৃদন্তপদকে / ক্রিয়াপদকে/ক্রিয়া বিশেষণকে/ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়।

গ. কৃৎ প্রত্যয়হীন পদকে/ কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে / ক্রিয়ামূলকে বলা হয় কৃদন্তপদ।

৯। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর

ঘাটতি, ঝলক, রাঁধুনি, ঝাড়ু, দর্শন, মুক্ত, মুগ্ধ, উপ্ত, ভোজ্য, জয়

দশম পরিচ্ছেদ

তদ্ধিত প্রত্যয়

১. ছেলেটি বড় **লাজুক**।

২. **বড়াই** করা ভালো না।

৩. **ঘরামি** ডেকে ঘর ছেয়ে নে।

ওপরের 'লাজুক', 'বড়াই' শব্দগুলো গঠিত হয়েছে এভাবে : লাজুক= লাজ + উক; বড়াই=বড়+আই; ঘরামি = ঘর+আমি। 'লাজ' 'বড়' ও 'ঘর' শব্দগুলোর পরে যথাক্রমে 'উক', 'আই' ও 'আমি' (প্রত্যয়) যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে।

শব্দের সঙ্গে (শেষে) যেসব প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়।

দ্রষ্টব্য : 'লাজ' 'বড়' ও 'ঘর'– এ শব্দগুলোর সাথে কোনো শব্দ/বিভক্তি যুক্ত হয় নি। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় **প্রাতিপদিক**। প্রাতিপদিক তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি বলে প্রাতিপদিককে **নাম প্রকৃতিও** বলা হয়।

ধাতু যেমন কৃৎ–প্রত্যয়ের প্রকৃতি, তেমনি প্রাতিপদিকও তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি। প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুকে বলা হয় **ক্রিয়া প্রকৃতি** এবং প্রাতিপদিককে বলা হয় **নাম প্রকৃতি**।

তদ্ধিত প্রত্যয়গুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার।

ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

খ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়।

গ. তৎসম বা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ।

(ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

১. আ–প্রত্যয়

(ক) অবজ্ঞার্থে : চোর + আ = চোরা, কেস্ট + আ = কেস্টা।

(খ) বৃহদার্থে : ডিঙি + আ= ডিঙা (সপ্তডিঙা মধুকর)।

(গ) সদৃশ অর্থে : বাঘ+আ=বাঘা, হাত + আ=হাতা। এরূপ : কাল –কালা (চিকন কালা), কান–কানা।

(ঘ) 'তাতে আছে' বা 'তার আছে' অর্থে : জল + আ=জলা, গোদ + আ=গোদা। এরূপ : রোগ –রোগা, চাল– চালা, লুন–লুনা>লোনা।

(ঙ) সমষ্টি অর্থে : বিশ –বিশা, বাইশ–বাইশা (মাসের বাইশা> বাইশে।

(চ) স্বার্থে : জট+আ=জটা, চোখ–চোখা, চাক–চাকা।

(ছ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : হাজির –হাজিরা, চাষ–চাষা।

(জ) জাত ও আগত অর্থে : মহিষ>ভইস–ভয়সা (ঘি), দখিন–দখিনা> দখনে (হাওয়া)।

২. আই–প্রত্যয়

(ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : বড়+আই=বড়াই, চড়া +আই=চড়াই।

(খ) আদরার্থে : কানু+আই=কানাই, নিম+আই=নিমাই।

(গ) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত বোঝাতে : বোন+আই= বোনাই, ননদ–নন্দাই, জেঠা–জেঠাই (মা)।

(ঘ) সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনে : মিঠা +আই=মিঠাই।

(ঙ) জাত অর্থে : ঢাকা+আই=ঢাকাই (জামদানি), পাবনা–পাবনাই (শাড়ি)।

(চ) বিশেষণ গঠনে : চোর–চোরাই (মাল), মোগল–মোগলাই (পরোটা)।

৩. আমি/আম/আমো/মি–প্রত্যয়

(ক) ভাব অর্থে : ইতর+আমি =ইতরামি, পাগল+আমি = পাগলামি, চোর+আমি =চোরামি, বাঁদর+আমি =বাঁদরামি, ফাজিল +আমো=ফাজলামো।

(খ) বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে : ঠক+আমো=ঠকামো (ঠকের বৃত্তি বা ভাব), ঘর+আমি=ঘরামি।

(গ) নিন্দা জ্ঞাপন : জেঠা+আমি=জেঠামি, ছেলে+আমি=ছেলেমি।

৪. ই/ঈ–প্রত্যয়

(ক) ভাব অর্থে : বাহাদুর +ই = বাহাদুরি, উমেদার–উমেদারি।

(খ) বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে : ডাক্তার–ডাক্তারি, মোক্তার–মোক্তারি, পোদ্দার–পোদ্দারি, ব্যাপার–ব্যাপারি, চাষ–চাষি।

(গ) মালিক অর্থে : জমিদার–জমিদারি, দোকান–দোকানি।

(ঘ) জাত, আগত বা সম্বন্ধ বোঝাতে : ভাগলপুর–ভাগলপুরি, মাদ্রাজ–মাদ্রাজি, রেশম–রেশমি, সরকার–সরকারি (সম্বন্ধ বাচক)।

৫. ইয়া> এ–প্রত্যয়

(ক) তৎকালীনতা বোঝাতে : সেকাল + এ=সেকেলে, একাল+এ=একেলে, ভাদর +ইয়া = ভাদরিয়া> ভাদুরে (কইমাছ)।

(খ) উপকরণ বোঝাতে : পাথর –পাথরিয়া> পাথুরে, মাটি –মেটে, বালি– বেলে।

(গ) উপজীবিকা অর্থে : জাল–জালিয়া>জেলে, মোট–মুটে।

(ঘ) নৈপুণ্য বোঝাতে : খুন–খুনিয়া> খুনে, দেমাক–দেমাকে, না (নৌকা) – নাইয়া> নেয়ে।

(ঙ) অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে : টনটন– টনটনে (জ্ঞান), কনকন –কনকনে (শীত), গনগন –গনগনে (আগুন), চকচক– চকচকে (জুতা)।

৬. উয়া> ও–প্রত্যয়

(ক) রোগগ্রস্ত অর্থে : জ্বর + উয়া = জ্বরুয়া>জ্বরো। বাত+উয়া=বাতুয়া> বেতো (ঘোড়া)।

(খ) যুক্ত অর্থে : টাক – টেকো।

(গ) সেই উপকরণে নির্মিত অর্থে : খড়–খড়ো (খড়োঘর)।

(ঘ) জাত অর্থে : ধান–ধেনো।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থে : মাঠ–মেঠো, গাঁ–গাঁইয়া> গেঁয়ো।

(চ) উপজীবিকা অর্থে : মাছ–মাছুয়া> মেছো।

(ছ) বিশেষণ গঠনে : দাঁত–দেঁতো (হাসি), ছাঁদ–ছেঁদো (কথা), তেল–তেলো> তেলা (মাথা), কুঁজ–কুঁজো (লোক)।

৭. **উ–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে : ঢাল +উ = ঢালু, কল+উ=কলু।

৮. **উক–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে : লাজ–লাজুক, মিশ–মিশুক, মিথ্যা–মিথ্যুক।

৯. **আরি/আরী/আরু–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে : ভিখ–ভিখারি, শাঁখ–শাঁখারি, বোমা–বোমারু।

১০. **আলি/আলো/আলি/আলী>এল–প্রত্যয়** : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে : দাঁত–দাঁতাল, লাঠি–লাঠিয়াল> লেঠেল, তেজ–তেজাল, ধার–ধারাল, শাঁস–শাঁসাল, জমক–জমকালো, দুধ–দুধাল> দুধেল, হিম–হিমেল, চতুর– চতুরালি, ঘটক– ঘটকালি, সিঁদ–সিঁদেল, গাঁজা–গেঁজেল।

১১. **উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে–প্রত্যয়** : হাট–হাটুরিয়া> হাটুরে, সাপ–সাপুড়িয়া>সাপুড়ে, কাঠ–কাঠুরে।

১২. **উড়–প্রত্যয়** : অর্থহীনভাবে : লেজ–লেজুড়।

১৩. **উয়া/ওয়া>ও–প্রত্যয়** : সম্পর্কিত অর্থে : ঘর+ওয়া = ঘরোয়া, জল+ উয়া=জলুয়া>জলো (দুধ)।

১৪. **আটিয়া / টে–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে : তামা–তামাটিয়া> তামাটে, ঝগড়া–ঝগড়াটে, ভাড়া–ভাড়াটে, রোগা–রোগাটে।

১৫. **অট>ট–প্রত্যয়** : **স্বার্থে** : ভরা –ভরাট, জমা–জমাট।

১৬. **লা–প্রত্যয়** : (ক) বিশেষণ গঠনে : মেঘ–মেঘলা

(খ) স্বার্থে : এক–একলা, আধ–আধলা।

(খ) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

১. **ওয়ালা > আলা (হিন্দি)** : বাড়ি–বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে), দিল্লি–দিল্লিওয়ালা (অধিবাসী অর্থে), মাছ–মাছওয়ালা (বৃত্তি অর্থে), দুধ–দুধওয়ালা (বৃত্তি অর্থে)।

২. **ওয়ান>আন (হিন্দি)** : গাড়ি–গাড়োয়ান, দার –দারোয়ান।

৩. **আনা>আনি (হিন্দি)** : মুনশি–মুনশিয়ানা, বিবি–বিবিআনা, হিন্দু–হিন্দুয়ানি।

৪. **পনা (হিন্দি)** : পানি–পানসা> পানসে, এক–একসা, কাল (কাল)–কালসা>কালসে।

৫. **গর> কর (ফারসি)** : কারিগর, বাজিকর, সওদাগর।

৬. **দার (ফারসি)** : তাঁবেদার, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারাদার।

৭. **বাজ (দক্ষ অর্থে –ফারসি)** : কলমবাজ, ধড়িবাজ, ধোঁকাবাজ, গলাবাজ+ই=গলাবাজি (বিশেষ্য)।

৮. **বন্দি (বন্দ্–ফারসি)** : জবানবন্দি, সারিবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দ।

৯. **সই : মতো অর্থে** : জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই।

দ্রষ্টব্য : 'টিপসই' ও 'নামসই' শব্দ দুটোর 'সই' প্রত্যয় নয়। এটি 'সহি' (অর্থ–স্বাক্ষর) শব্দ থেকে উৎপন্ন।

(গ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ইত, ইমন, ইল, ইষ্ট, ঈন, তর, তম, তা, ত্ব, নীন, নীয়, বতুপ্, বিন্, র, ল প্রভৃতি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয়, সেগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় । এখানে কতগুলো সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দেয়া হলো।

কয়েকটি সাধারণ সূত্র

১. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ)–প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা– নগর+ষ্ণ=নাগর, মধুর +ষ্ণ=মাধুর্য।

বৃদ্ধি : (১) অ–স্থানে আ, (২) ই, ঈ–স্থানে ঐ, (৩) উ, ঊ–স্থানে ঔ এবং (৪) ঋ–স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

২. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ–কারও ও–কারে পরিণত হয়। ও +অ সন্ধিতে 'অব' হয়। যথা–গুরু+ষ্ণ=গৌরব, লঘু+ষ্ণ =লাঘব, শিশু +ষ্ণ=শৈশব, মধু +ষ্ণ=মাধব, মনু + ষ্ণ=মানব।

৩. দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দের অথবা উপসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপসর্গসহ শব্দের বা শব্দ দুটির মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা–

পরলোক +ষ্ণিক =পারলৌকিক।

সুভগ+ষ্ণ্য=সৌভাগ্য।

পঞ্চভূত+ষ্ণিক=পাঞ্চভৌতিক।

সর্বভূমি+ ষ্ণ=সার্বভৌম।

ব্যতিক্রম : 'বর্ষ' শব্দ পরপদ হলে পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দের মূল স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যথা–দ্বিবর্ষ +ষ্ণিক= দ্বিবার্ষিক। সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকলেও নিয়মমতো মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন –বর্ষ + ষ্ণিক=বার্ষিক।

৪. 'য' প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে স্থিত অ, আ, ই এবং ঈ–এর লোপ হয়। যথা – সম্+য =সাম্য, কবি +য =কাব্য, মধুর +য =মাধুর্য, প্রাচী+য=প্রাচ্য।

ব্যতিক্রম : সভা+য=সভ্য ('সাভ্য' নয়)।

কয়েকটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

১. **ইত–প্রত্যয়** : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

কুসুম +ইত=কুসুমিত, তরঙ্গা+ইত=তরঙ্গিত, কণ্টক+ইত=কণ্টকিত।

২. **ইমন্–প্রত্যয়** : বিশেষ্য গঠনে

নীল+ইমন=নীলিমা। মহৎ+ইমন=মহিমা।

৩. **ইল্–প্রত্যয়** : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

পঙ্ক+ইল্=পঙ্কিল, উর্মি +ইল্ =ঊর্মিল, ফেন+ইল্=ফেনিল।

৪. **ইষ্ঠ–প্রত্যয়** : অতিশায়নে

গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ, লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ।

৫. **ইন্ (ঈ)–প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ** গঠনে

জ্ঞান +ইন্= জ্ঞানিন্ সুখ+ইন্=সুখিন্।

গুণ+ইন্=গুণিন্ মান+ইন্=মানিন্।

সমাসে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্ লোপ পায়। যেমন – জ্ঞানীগণ, গুণিগণ, সুখিগণ, মানিজন ইত্যাদি ।

কর্তৃকারকের এক বচনে ইন্ প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে। যেমন–

জ্ঞান+ইন্ (ঈ) –জ্ঞানী, গুণ+ ইন্(ঈ) গুণী ইত্যাদি।

স্ত্রী লিঙ্গে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে ঈ–যুক্ত হয়ে ইনী রূপ গ্রহণ করে। যেমন–

জ্ঞান+ইনী–জ্ঞানিনী, গুণ+ইনী =গুণিনী ইত্যাদি।

৬. **তা ও ত্ব–প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে**

বন্ধু+ তা =বন্ধুতা, শত্রু+তা = শত্রুতা।

বন্ধু+ত্ব=বন্ধুত্ব, গুরু+ত্ব = গুরুত্ব।

ঘন+ত্ব=ঘনত্ব, মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব।

৭. **তর ও তম–প্রত্যয় : অতিশায়নে**

মধুর–মধুরতর, মধুরতম। প্রিয়–প্রিয়তর, প্রিয়তম।

৮. **নীন (ঈন)– প্রত্যয় : তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ গঠনে**

সর্বজন+নীন=সর্বজনীন, কুল+নীন =কুলীন, নব+নীন=নবীন।

৯. **নীয় (ঈয়) –প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে**

জল+নীয় =জলীয়, বায়ু+নীয় =বায়বীয়, বর্ষ+নীয় =বর্ষীয়।

বিশেষ নিয়মে : পর–পরকীয়, স্ব–স্বকীয়, রাজা–রাজকীয়।

১০. বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)–প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে যথাক্রমে 'বান্ এবং 'মান্' হয়] : বিশেষণ গঠনে

গুণ+বতুপ্=গুণবান, দয়া+বতুপ্ = দয়াবান।

শ্রী+মতুপ্=শ্রীমান, বুদ্ধি+মতুপ্=বুদ্ধিমান।

১১. বিন (বী) প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে

মেধা+বিন্=মেধাবী, মায়া+বিন্ = মায়াবী, তেজঃ+বিন্= তেজস্বী, যশঃ +বিন্=যশস্বী।

১২. র–প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

মধু+র=মধুর, মুখ+র=মুখর।

১৩. ল–প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

শীত +ল = শীতল, বৎস +ল= বৎসল।

১৪. ষ্ণ (অ) প্রত্যয়

(ক) অপত্য অর্থে : মনু+ষ্ণ =মানব, যদু +ষ্ণ=যাদব।

(খ) উপাসক অর্থে : শিব+ ষ্ণ= শৈব, জিন+ষ্ণ=জৈন।এরূপ: শক্তি–শাক্ত, বুদ্ধ–বৌদ্ধ, বিষ্ণু–বৈষ্ণব।

(গ) ভাব অর্থে : শিশু +ষ্ণ =শৈশব, গুরু+ষ্ণ =গৌরব, কিশোর+ষ্ণ=কৈশোর।

(ঘ) সম্পর্ক বোঝাতে : পৃথিবী+ ষ্ণ = পার্থিব, দেব+ষ্ণ=দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম)+ ষ্ণ=চৈত্র।

নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষ্ণ=সৌর (সাধারণ নিয়মে সুর+ষ্ণ (অ)=সৌর)।

১৫. ষ্ণ্য (য) প্রত্যয়

(ক) অপত্যার্থে : মনুঃ +ষ্ণ্য=মনুষ্য, জমদগ্নি+ষ্ণ্য=জামদগ্ন্য।

(খ) ভাবার্থে : সুন্দর+ষ্ণ্য=সৌন্দর্য, শূর+ষ্ণ্য=শৌর্য। ধীর+ষ্ণ্য=ধৈর্য, কুমার +ষ্ণ্য =কৌমার্য।

(গ) বিশেষণ গঠনে : পর্বত +ষ্ণ্য = পার্বত্য, বেদ+ষ্ণ্য =বৈদ্য।

১৬. ষ্ণি (ই)–প্রত্যয় : অপত্য অর্থে

রাবণ+ষ্ণি=রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি।

১৭. ষ্ণিক (ইক)–প্রত্যয়

(ক) দক্ষ বা বেত্তা অর্থে : সাহিত্য +ষ্ণিক=সাহিত্যিক, বেদ+ষ্ণিক=বৈদিক, বিজ্ঞান+ষ্ণিক=বৈজ্ঞানিক।

(খ) বিষয়ক অর্থে : সমুদ্র+ষ্ণিক=সামুদ্রিক, নগর–নাগরিক, মাস–মাসিক, ধর্ম–ধার্মিক, সমর–সামরিক, সমাজ–সামাজিক।

(গ) বিশেষণ গঠনে : হেমন্ত +ষ্ণিক=হৈমন্তিক, অকস্মাৎ+ষ্ণিক=আকস্মিক।

১৮. ষ্ণেয় (এয়)–প্রত্যয়

ভগিনী+ষ্ণেয়=ভাগিনেয়, অগ্নি+ষ্ণেয়=আগ্নেয়, বিমাতৃ (বিমাতা) +ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়।

অনুশীলনী

১। তদ্ধিত প্রত্যয় বলতে কী বোঝ? তদ্ধিত প্রত্যয়কে শব্দ প্রত্যয় বলা যায় কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতি বলা হয় কেন?

৩। নিম্নলিখিত খাঁটি বাংলা তদ্ধিতান্ত শব্দসমূহে কী অর্থে কোন কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।

হাজিরা	–	জলা	–	মিঠাই	–	লেজুড়	–	চামচা	–
দরকারি	–	টেকো	–	মিথ্যুক	–	ঘরোয়া	–	ঢাকাই	–

৪। দুটি করে উদাহরণ দাও।

(ক) ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির (প্রাতিপদিকের) স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(খ) ষ্ণ প্রত্যয় যুক্ত হলে মূলস্বরের বৃদ্ধি ছাড়াও প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উ–কার থাকলে তা ও–কার হয়।

(গ) তদ্ধিতান্ত শব্দের প্রকৃতি দুটি শব্দে গঠিত হলে অথবা শব্দটি উপসর্গযুক্ত থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই (উপসর্গসহ) মূলস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

কাব্য, ভাগিনেয়, বৈজ্ঞানিক, বায়বীয়, সর্বজনীন, সুখী, কুসুমিত, ফেনিল, শীতল, মধুর, কুলীন, পার্বত্য, বৌদ্ধ, সূর্য, পৌরুষ, মেধাবী।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক. প্রাতিপদিক বলা হয়– বিভক্তিযুক্ত পদকে / সমস্যমান পদকে/ বিভক্তিহীন পদকে।

খ. বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় – দুই প্রকার / তিন প্রকার / চার প্রকার

গ. ওয়ালা (দুধওয়ালা) – বাংলা / বিদেশি/ তৎসম তদ্ধিত প্রত্যয়

ঘ. উড় (লেজুড়) – বাংলা / বিদেশি/ তৎসম তদ্ধিত প্রত্যয়

ঙ. ইত (কুসুমিত) বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্ধিত প্রত্যয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) মৌলিক ও (খ) সাধিত

২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) যৌগিক, (খ) রূঢ়ি এবং (গ) যোগরূঢ়

৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) তৎসম, (খ) অর্ধ–তৎসম (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি ও (ঙ) বিদেশি।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন – গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), ডুবুরি (ডুব্+উরি), চলন্ত (চল্ + অন্ত), প্রশাসন (প্র+শাসন), গরমিল (গর+মিল) ইত্যাদি।

২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. যৌগিক শব্দ

খ. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

গ. যোগরূঢ় শব্দ

ক. যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন–

গায়ক = গৈ + ণক (অক) – অর্থ : গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।

মধুর = মধু + র –অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।

দৌহিত্র = দুহিতা+ষ্ণ্য –অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।

চিকামারা = চিকা+মারা –অর্থ : দেওয়ালের লিখন।

খ. রূঢ়ি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন–হস্তী=হস্ত + ইন, অর্থ–হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো+এষণা) অর্থ– গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এ রকম–

বাঁশি – বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

তৈল – শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন– বাদাম–তেল।

প্রবীণ – শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সন্দেশ – শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।

গ. **যোগরূঢ় শব্দ** : সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন–

পঙ্কজ – পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।

রাজপুত – 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।

মহাযাত্রা – মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দরূপে অর্থ 'মৃত্যু'।

জলধি – 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

৩. **উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ** : বাংলা ভাষা অধ্যায়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে। বিভাগগুলোর নাম লেখ।

২। অর্থগতভাবে বা অর্থের বিচার–বিশ্লেষণে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে, উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহ রূঢ়ি, যোগরূঢ় ও যৌগিক–এই তিনটি গুচ্ছে প্রদত্ত ছক অনুসারে সাজাও।

ভাগিনেয়, জলধি, রাজপুত, রাজপুত্র, বাঁশি, তেল, সন্দেশ।

রূঢ়ি	যোগরূঢ়	যৌগিক শব্দ

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত এবং ব্যবহারিক অর্থ লেখ।

ক) সন্দেশ খ) হরিণ গ) প্রবীণ ঘ) মহাযাত্রা

৫। নিচের শব্দগুলো কোনটি কোন শ্রেণিতে পড়ে লেখ।

নীলিমা, এক, জনৈক, হাত, ছেলেধরা, সাপ, আসমান–জমিন, বেহায়াপনা, সাপুড়িয়া, হাত–পা, লাজুক, সাংবাদিক, পাগলামি, বাড়িওয়ালা, চা বাগান।